পলিসি ব্রিফ
#১৫৮/২০২৬
নভেম্বর ২০২৬

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি : টিআইবির সুপারিশ

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে" (অনুচ্ছেদ ৭)। নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে, যেমন– সংসদের অধিবেশনে মন্ত্রীদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন, জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের জবাবদিহি। যেহেতু জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যগণ অঙ্গীকারবদ্ধ, সেহেতু তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং এ জন্য নৈতিক আচরণ নিশ্চিত করা–সংসদের ভেতরে এবং বাইরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একজন সংসদ সদস্য সংসদের ভেতরে কীভাবে তাঁর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, তা সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতে বিস্তারিত বলা হয়েছে (বিধি ২৬৭-২৭৭)। তবে এ সব বিধিতে কেবল সংসদের ভেতরে সংসদ সদস্যদের পালনীয় কোনো কোনো আচরণ সম্পর্কে বলা হলেও সংসদের বাইরে তাদের কেমন আচরণ ও দায়-দায়িত্ব পালন করা বাঞ্ছনীয়, তা নির্ধারণ করা হয়নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত কোনো সরকারই আইনপ্রণেতাদের জন্য কোনো বাধ্যতামূলক নৈতিক আচরণবিধি প্রবর্তন করেনি। এখন পর্যন্ত দুইবার সংসদ সদস্যদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০০৩ সালে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল বিএনপির সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান প্রথম "দ্য মেম্বার অব পার্লামেন্ট (কোড অব কনডাক্ট) বিল-২০০৩" নামক একটি বেসরকারি বিলের নোটিশ দিয়েছিলেন। বিলটি তৎকালীন জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে তা আইনে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ২০১০ সালে নবম সংসদের মেয়াদে "সংসদ সদস্য আচরণ আইন, ২০১০" নামের আরেকটি বেসরকারি বিল উত্থাপিত হলেও শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয়নি।

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের একাংশ অসদাচরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং আর্থিক ও অন্যান্য ধরনের কেলেঙ্কারির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আসছেন। ২০১২ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)–এর একটি গবেষণায় দেখা যায়, গবেষণাভুক্ত সংসদ সদস্যদের ৯৭ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের "নেতিবাচক" আচরণে জড়িত ছিলেন, যার মধ্যে প্রশাসনিক কাজে প্রভাব বিস্তার, উন্নয়ন বরাদ্দের অপব্যবহার, অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত হওয়া বা সমর্থন করা, সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার, নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১] দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংসদের কোনো কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বেশ কিছু অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নির্বাচনী হলফনামায় আয় ও সম্পদের তথ্য গোপন,[২] দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ অর্জন, রাজনৈতিক সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন, মানবপাচার, অর্থপাচার ও চোরাচালানে জড়িত থাকা, ঋণখেলাপ, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হত্যাকাণ্ড, ক্ষমতার অপব্যবহার, সেক্সটরশন[৩] (sextortion), নারীসংক্রান্ত গুরুতর নৈতিক স্খলন ও আত্মহত্যায় প্ররোচণা, নারী সংসদ সদস্যদের নিয়ে আপত্তিকর ও বডি-শেইমিং মন্তব্য করা, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার, বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিজ এলাকা ও আত্মীয়স্বজনের প্রাধান্য দেওয়া, জমি দখলের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হামলা, ভাঙচুর ও গুঁড়িয়ে দেওয়া, ভয়ভীতি দেখানো, ইত্যাদি। এ ছাড়া, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের বেশিরভাগই জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রচারণার জন্য ব্যয়ের নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন বলেও টিআইবির আরেকটি গবেষণায় দেখা যায়।[৪] এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সংসদ সদস্যদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার প্রবণতা আরও বেড়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্তত দুই বছরের কারাদণ্ড হলে একজন ব্যক্তি সংসদ সদস্য থাকার অযোগ্য হন [অনুচ্ছেদ ৬৬(২)(ঘ)]। কিন্তু উপরোল্লিখিত ধরনের গুরুতর নৈতিক স্খলন, স্বার্থের সংঘাত, ক্ষমতার অপব্যবহার, সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী বা সংসদ অবমাননাকর আচরণের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে এবং কোন পরিস্থিতিতে সংসদ সদস্যপদ বাতিল বা আসন শূন্য হওয়া বা অন্য কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন উঠবে–এ সংক্রান্ত বিধান সুস্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত অনুভূত হচ্ছে।

২০২৪ সালে কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে গঠিত নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন তার প্রতিবেদনে একটি "সংসদ সদস্য আচরণ আইন" প্রণয়নের সুপারিশ করে, যেখানে সংসদ সদস্যদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়া এবং স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে।[৫] পরবর্তীতে সব দলের অংশগ্রহণে এবং সম্মতিতে তৈরি জুলাই জাতীয় সনদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য বৃহত্তর জবাবদিহিতাসহ একাধিক প্রশাসনিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। জুলাই জাতীয় সনদের

[১] টিআইবি, 'নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা,' অক্টোবর ২০১২, https://ti-bangladesh.org/images/files/Research%20and%20Policy/MP_Study_Full%20Report_211012.pdf (৮ অক্টোবর ২০২৬)।
[২] টিআইবি, 'নির্বাচনী হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ: এটি জনসাধারণকে কী বার্তা দেয়?,' ডিসেম্বর ২০২৩, https://ti-bangladesh.org/bn/articles/research/6930 (৮ নভেম্বর ২০২৬)।
[৩] এক ধরনের ব্ল্যাকমেল, যেখানে যৌন সুবিধা প্রদান না করলে যৌনতাপূর্ণ ছবি বা তথ্য প্রকাশ করার হুমকি দেওয়া হয়।
[৪] দেখুন টিআইবি, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং', ২০২৬, https://ti-bangladesh.org/bn/articles/research/7438; 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং,' ২০২৪, https://ti-bangladesh.org/bn/articles/research/6895; 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা', ২০১৯, https://ti-bangladesh.org/bn/articles/research/5750।
[৫] *Summary Report of 6 Major Reform Commissions 2025,* নির্বাচন সংস্কার সংশোধন বিষয়ক কমিশন, সুপারিশ ৮.৬ (খ)।

প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে রয়েছে, সংসদীয় বিশেষাধিকারের সীমা নির্ধারণের জন্য সংবিধানের ৭৮ (৫) অনুচ্ছেদের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় কমিটি ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার, অধিকারের সীমা ও দায় নির্ধারণ করা (ধারা ৪৮) এবং সকল স্তরের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে এবং তারপর প্রতি বছর নির্বাচন কমিশনের কাছে নিজেদের ও তাদের পরিবারের আয় ও সম্পদের বিবরণী জমা দেওয়া এবং সেই ঘোষণাগুলো কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা (ধারা ৭৪)।[৬] উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে সরকার গঠনকারী ও বিরোধীদলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলো এই ধারাগুলোতে সম্মতি দিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে জনপ্রতিনিধিদের জন্য অবিলম্বে বিশেষায়িত ও বাধ্যতামূলক নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছে টিআইবি। জুলাই ২০২৪-পরবর্তী সংস্কার প্রস্তাব এবং ২০২৬ সালে বর্তমান সরকারের কাছে দেওয়া সুপারিশে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য কার্যকর আচরণবিধি প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করে টিআইবি।[৭] এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি বা আইন প্রণয়নের দাবি পুনর্ব্যক্ত করছে।

সংসদ সদস্যদের জন্য প্রস্তাবিত আচরণবিধি সরকারি বিল হিসেবে সংসদে উত্থাপন, ন্যূনতম সময়ে আইনে পরিণত এবং অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। প্রচলিত আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আচরণবিধি অথবা আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে–এই মর্মে আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে। উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রবর্তিত হলে, উভয় কক্ষের সদস্যদের জন্যই এই আচরণ আইন প্রযোজ্য হবে এবং অনুরূপ আচরণবিধি সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের জন্যও প্রণয়ন করতে হবে।

টিআইবি প্রস্তাবিত সংসদ সদস্য আচরণবিধিতে অথবা আইনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছে–

১. সংসদের ভেতরে সংসদ সদস্যদের পালনীয় আচরণ

১.১. সংসদের ভেতরে সংসদ অধিবেশনে সদস্যরা সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী আচরণ করবেন।

১.২. সংসদের পবিত্রতা, সম্মান ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখতে সংসদ সদস্যগণ পরমতসহিষ্ণু হবেন এবং ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

১.৩. সংসদে আলোচনা বা বক্তব্য উপস্থাপনে ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসামূলক বক্তব্য, অশোভন ও কুরুচিপূর্ণ সমালোচনা বা অতিরঞ্জিত স্তুতি, কটু বা অশ্লীল ভাষা এবং অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি ও দেহ-ভাষা সচেতনভাবে পরিহার করবেন।

১.৪. সংসদ সদস্যরা সংসদ কক্ষ বা কমিটিতে শারীরিক সংঘর্ষ বা হুমকিতে জড়াবেন না এবং সংসদ সচিবালয়ের কর্মচারীসহ সকলের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করবেন।

১.৫. সংসদ সদস্যরা সংসদ অধিবেশন ও যে কমিটির সদস্য, সেই কমিটির বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন এবং কমিটির সদস্য হিসেবে নিরপেক্ষভাবে ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অবস্থান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২. সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের পালনীয় আচরণ

২.১. **আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা:** সংসদ সদস্যরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালনে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেবেন এবং ব্যক্তিজীবনে আইনের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হবেন। বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠার পথে কোনো প্রকার অন্তরায় বা প্রভাব সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবেন।

২.২. **স্বচ্ছতা:** দায়িত্ব পালনকালে তাঁদের দায়িত্বের সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কিত থাকলে, তা প্রকাশ করবেন এবং জনস্বার্থ সংরক্ষণের স্বার্থে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব নিরসনে ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। যে কোনো সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা অবলম্বন করবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের যথাযথ কারণসমূহ তাঁরা উপস্থাপন করবেন।

২.৩. **জবাবদিহি:** সদস্যরা তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করবেন এবং অবশ্যই তাঁরা যে কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো সংসদ সদস্য তাঁর প্রত্যেকটি কাজের সিদ্ধান্তের এবং সরকারি কার্য গ্রহণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। জনপ্রতিনিধি হিসেবে সরকারি কাজে শুধু নীতিনির্ধারণ ও তদারকির দায়িত্ব পালন করবেন।

২.৪. **জনস্বার্থ বিবেচনা:** সদস্যরা নিজেদের, তাঁদের পরিবার অথবা স্বজনদের কোনো ধরনের আর্থিক অথবা বস্তুগত সুবিধা লাভের জন্য নয়, শুধু জনস্বার্থকে বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। দায়িত্ব পালনকালে নিয়োগ, চুক্তি সম্পাদন অথবা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান এবং কোনো ধরনের সুবিধা প্রদানে সুপারিশসহ যে কোনো ধরনের কাজে মেধা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাকে অবশ্যই প্রাধান্য দেবেন। সরকারি বা বেসরকারি খাতে কোনো প্রকার নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো সিদ্ধান্তে সুবিধা দিতে সদস্যরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে সুপারিশ বা অন্যান্য হস্তক্ষেপ অথবা স্বীকৃত পদ্ধতির পরিবর্তন করবেন না।

---

[৬] জাতীয় ঐকমত্য কমিশন, জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫: ভবিষ্যতের পথরেখা, অক্টোবর ২০২৫।

[৭] টিআইবি, 'সরকারের সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ কৌশলগত প্রাধান্য – টিআইবির সুপারিশ,' পলিসি ব্রিফ # ১৫৫/২০২৬, মে ২০২৬, https://ti-bangladesh.org/upload/files/policy-brief/2026/TIB-Policy-Brief-on-Keeping-Good-Governance-Commitments-Bn.pdf (৮ অক্টোবর ২০২৬)।

২.৫. **দেশের মর্যাদা রক্ষা:** সংসদ সদস্যরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেশ ও দেশের বাইরে এমন সকল কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবেন, যার মাধ্যমে স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের গৌরব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। সংসদ সদস্যদের আচরণের কারণে সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে, এমন আচরণ থেকে সংসদ সদস্যগণ বিরত থাকবেন।

২.৬. **ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা:** সংসদ সদস্যরা মানবাধিকার ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হবেন। একইসঙ্গে শিশু, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধিতা ও জেন্ডার বৈচিত্র্যসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগণের উন্নয়ন ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

৩. স্বার্থগত দ্বন্দ্ব

৩.১. সংসদ সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের বা অন্যের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে জ্ঞাতসারে কোনো কার্য সম্পাদনে অবৈধ এবং অসৎ পথ অবলম্বন করবেন না।

৩.২. সংসদ সদস্যরা নিজের এবং পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব, আয় ও সম্পদের উৎসসংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে সংসদ শুরুর প্রথম অধিবেশনের মধ্যে অথবা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণের ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রকাশ করবেন এবং পরবর্তীতে প্রতি বছর একই ক্যালেন্ডার মাসে নবায়ন করবেন। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশোধিত ঘোষণা দিতে হবে। স্বার্থগত দ্বন্দ্বসংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রদান করতে হবে, তার মধ্যে রয়েছে– আয় ও সম্পদের বিবরণ, কোম্পানির পরিচালনা, বেতনভোগী নিয়োগ, অনুদান গ্রহণ, উপঢৌকন ও আতিথেয়তা গ্রহণ, বিদেশ ভ্রমণে সুবিধা গ্রহণ, বিদেশে উপঢৌকন গ্রহণ, স্থাবর সম্পদ (জমিজমা) সংক্রান্ত তথ্য, কোম্পানির শেয়ারের সুবিধা, ইত্যাদি। এ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে বর্ণিত নৈতিকতা কমিটি যাচাই-বাছাই করে ওয়েবসাইট ও উক্ত কমিটির বুলেটিনের বিশেষ সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

৩.৩. স্বার্থগত দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সদস্যরা স্বয়ং দায়বদ্ধ থাকবেন। কোনো ধরনের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব এড়ানোর লক্ষ্যে তাঁরা তাঁদের সংসদীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন এবং সেই আলোকে ব্যক্তিগত বিষয় ও জীবনাচারকে বিন্যস্ত করবেন।

৩.৪. কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে যে কোনো ধরনের স্বার্থগত দ্বন্দ্ব প্রকাশে সংসদ সদস্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কোনো বিল, কমিটির সুপারিশ, সরকারি চুক্তি, লাইনেন্স, ঋণ, প্রকল্প বা নিয়োগে সদস্যের প্রত্যক্ষ আর্থিক স্বার্থ থাকলে, তিনি আলোচনার আগে তা ঘোষণা করবেন। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার দ্বিধা সৃষ্টি বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, নৈতিকতা কমিটির শরণাপন্ন হয়ে যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৩.৫. সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিবারের কোনো সদস্য বা আত্মীয়-স্বজনকে নিয়োগ দিতে পারবেন না বা নিয়োগের সুপারিশ করতে পারবেন না। একইভাবে পরিবারের কোনো সদস্য বা আত্মীয়-স্বজনকে কোনো ধরনের সুবিধা দিতে পারবেন না বা সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করতে পারবেন না।

৪. আর্থিক বিষয়াবলী

৪.১. সংসদ সদস্য আর্থিক প্রতিদান বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে সংসদ বা এর কোনো কমিটিতে কোনো বিষয় উত্থাপন, কোনো বিল বা প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রদান ও ভোট দান অথবা কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না।

৪.২. সংসদ সদস্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সঙ্গে এমনভাবে কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো বাধ্যবাধকতায় সম্পৃক্ত হবেন না, যা তাঁদের সংসদীয় দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করতে পারে।

৪.৩. সরকারি ক্রয়-বিক্রয়, প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত সরকারি নীতিনির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্য নামে-বেনামে কোনো প্রকার ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রভাব বিস্তার বা স্বার্থ অর্জন থেকে বিরত থাকবেন। একইভাবে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহণ অথবা অনুমোদন, পুনঃতফসিল, সুদ মওকুফ, খেলাপি ঋণসংক্রান্ত ব্যবস্থা, লাইসেন্স বা নিয়ন্ত্রক সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত বা সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য অনুচিত প্রভাব বিস্তার করবেন না।

৪.৪. সংসদ সদস্য অন্য কোনো পারিশ্রমিকভিত্তিক কাজ গ্রহণ করলে, তা সংসদীয় দায়িত্ব পালনে বাধা হবে না এবং এক্ষেত্রে সে কাজের লিখিত চুক্তিতে স্পষ্ট থাকবে যে, তিনি নিয়োগকারীর পক্ষে লবিইং করবেন না। কোনো সদস্য অর্থ বা সুবিধার বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সংসদ, মন্ত্রী বা সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে কীভাবে প্রভাব খাটাতে হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেবেন না এবং যার কাছ থেকে অর্থ বা অন্য কোনো সুবিধা নিয়েছেন, তার পক্ষে কোনো সুবিধা আদায়ের জন্য মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তার কাছে সুপারিশ করবেন না। এ ছাড়া, সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ বা চুক্তির আলোচনায় থাকা প্রতিষ্ঠানে কোনো পারিশ্রমিকভিত্তিক পদ গ্রহণ করবেন না।

৪.৫. সংসদ সদস্য তাঁর প্রভাব খাটিয়ে পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সহযোগীকে সরকারি ঠিকাদারি, টেন্ডার, লাইসেন্স, প্লট বা অন্য কোনো সম্পদ, ইজারা বা ঋণ পাইয়ে দেবেন না, নিজের সম্পদ অন্য কারও নামে-বেনামে রাখবেন না এবং পরিবারের সদস্যের অবৈধ সুবিধা বা সম্পদ অর্জনের বিষয়ে জেনেও নীরব থাকলে বা সহায়তা করলে তা তাঁর নিজের দ্বারা এ আইন লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে।

৪.৬. সংসদ সদস্যরা নিজে বা অন্য কারও মাধ্যমে ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, পরিবহণ খাত, হাটবাজার, নির্মাণ প্রকল্প বা অন্য কোনো উৎস থেকে চাঁদা বা কমিশন দাবি বা গ্রহণ করবেন না এবং টেন্ডার, দখল বা কাজ বণ্টনে কোনো সিন্ডিকেট গঠন বা পৃষ্ঠপোষকতা করবেন না। সংসদ সদস্যরা নিজের অনুসারী, দলীয় কর্মী বা আত্মীয়দের চাঁদাবাজি, জমি বা প্রতিষ্ঠান দখল, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা সহিংসতায় মদদ বা আশ্রয় দেবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করবেন না এবং এ ধরনের তথ্য পেলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে অবহিত করবেন।

৪.৭. মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দুই বছর পর্যন্ত সাবেক সংসদ সদস্যরা অর্থ বা সুবিধার বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সংসদ সদস্য, মন্ত্রী বা সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে লবিইং করবেন না এবং সংসদ সদস্য থাকাকালে প্রাপ্ত জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত কোনো গোপনীয় তথ্য ব্যবহার বা প্রকাশ করবেন না।

৫. উপঢৌকন বা সেবা গ্রহণ

সংসদ সদস্যরা ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্যমানের উর্ধ্বে কোনো উপঢৌকন বা সেবা গ্রহণ করলে, তা নৈতিকতা কমিটিকে অবহিত করবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উপঢৌকন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেবেন। স্বার্থগত দ্বন্দ্বে অথবা সদস্যদের দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কোনো উপঢৌকন বা সেবা অবশ্যই গ্রহণ করবেন না।

৬. সরকারি সম্পদের ব্যবহার

আইন, নীতিমালা ও বিধি অনুসারে সংসদ সদস্যরা সরকারি সম্পদ এবং বিশেষ সুবিধা ভোগ করবেন। তবে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ কোনো অবস্থাতেই আর্থিক উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবেন না।

৭. তথ্য প্রকাশ ও তথ্যের ব্যবহার

৭.১. তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রকাশে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এমন তথ্য যথানিয়মে প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবেন। কোনো ক্ষেত্রে (যেমন– নির্বাচন কমিশনে হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রদান) অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য প্রদান করবেন না বা সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য গোপন রাখবেন না।

৭.২. সংসদ সদস্য হিসেবে তথ্য অধিকার আইন বা অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী জনগণকে জানানো যাবে না, এমন কোনো গোপনীয় তথ্য অবগত হলে, তিনি জ্ঞাতসারে অবশ্যই তা ব্যবহার বা প্রকাশ করবেন না।

৮. সংসদ বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে চালিত না করা

সংসদ সদস্যগণ অবশ্যই জ্ঞাতসারে তাদের বিবৃতি ও বক্তব্য বা অন্য কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে সংসদ বা জনগণকে বিভ্রান্ত ও ভুল পথে চালিত করবেন না। কোনো বক্তব্য, অবস্থান বা তথ্য ভুল বলে প্রতীয়মান হলে, স্বপ্রণোদিতভাবে যত দ্রুত সম্ভব, তা উপযুক্ত পদ্ধতিতে সংশোধন করতে বাধ্য থাকবেন।

৯. বাক্‌স্বাধীনতা

৯.১. সংসদ সদস্যরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন ও সার্বিক আচরণে গণতান্ত্রিক, মুক্তবুদ্ধি, সহনশীল, বস্তুনিষ্ঠ, চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ অভিমতের প্রতিফলন ঘটাবেন এবং প্রয়োজনে আইনগতভাবে নির্ধারিত বিষয় ছাড়া, অন্য সকল ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থ বা অবস্থানের উর্ধ্বে থেকে স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠভাবে মতামত ব্যক্ত করবেন।

৯.২. সংসদ সদস্যরা নিজ দল, অন্য কোনো দল, অথবা দলনিরপেক্ষ ভিন্ন কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার বক্তব্য, মন্তব্য বা মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন, সকল নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিত করবেন এবং ভিন্নমত দমনের যে কোনো অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন এবং প্রতিহত করতে সচেষ্ট থাকবেন।

১০.সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আচরণ

১০.১. সংসদ সদস্যদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন আচরণ করতে হবে, যা সংসদের মর্যাদা ও নৈতিক মান বজায় রাখে।

১০.২.কোনো সদস্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্য কোনো সদস্য বা সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু লেখা বা বলার ক্ষেত্রে কোনো ভুল বা অপতথ্য, অবমাননাকর, সাম্প্রদায়িক, বর্ণবাদী বা লিঙ্গবৈষম্যমূলক ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন না; এমনকি এমন কোনো বিষয়বস্তুও ব্যবহার করতে পারবেন না, যা অবমাননাকর, বর্ণবাদী বা লিঙ্গবৈষম্যমূলক।

১০.৩.সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সময় কোনো সদস্য সহিংসতায় উসকানি দিতে পারবেন না কিংবা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য (হেট স্পিচ) প্রচার করতে পারবেন না। একইসঙ্গে, কোনো সদস্য এমন কোনো বক্তব্য বা বিষয়বস্তু লাইক, শেয়ার বা তাতে মন্তব্য করতে পারবেন না, যা অবমাননাকর, সাম্প্রদায়িক, বর্ণবাদী, লিঙ্গবৈষম্যমূলক অথবা যা সহিংসতা বা বিদ্বেষমূলক বক্তব্যকে উসকে দেয় বা প্রচার করে।

১১. হয়রানি, দুর্ব্যবহার ও সহিংসতা প্রতিরোধ

১১.১. সংসদ সদস্যরা সহকর্মী সংসদ সদস্য, সংসদ সচিবালয়ের কর্মচারী, নিজস্ব কর্মী, দর্শনার্থী বা সাধারণ নাগরিক–কারও প্রতি যৌন হয়রানি, যৌন সুবিধা আদায়ের জন্য ভয় বা প্রলোভন দেখানো বা সুবিধা প্রদান (সেক্সটরশন), শারীরিক, মৌখিক বা মানসিক হয়রানি, বুলিং, লিঙ্গ, ধর্ম, জাতিসত্তা, জেন্ডার বা প্রতিবন্ধীতার ভিত্তিতে অবমাননাকর আচরণ, এবং অনুমতি ছাড়া কারও ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্য প্রকাশ বা অপব্যবহার করবেন না।

১১.২. এসব অভিযোগের জন্য নিম্নে উল্লিখিত নৈতিকতা সচিবালয়ের অধীনে একটি পৃথক, গোপনীয় ও স্বাধীন অভিযোগ ব্যবস্থা থাকবে। অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখা হবে, অভিযোগকারী বা সাক্ষীর প্রতি প্রতিশোধমূলক আচরণ পৃথক লঙ্ঘন বা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তদন্ত তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

১২. আচরণবিধির প্রয়োগকাঠামো

১২.১. এই আচরণবিধি বা আইন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য সংসদে "নৈতিকতা কমিটি" নামে একটি সংসদীয় নৈতিক আচরণ-সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি গঠিত হবে।

১২.২. সংসদীয় বিশেষ কমিটির নিয়ন্ত্রণকারী সকল বিধি বিধান এই কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১২.৩. সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে ৯ বা ১১ সদস্যবিশিষ্ট (বেজোড় সংখ্যক) এই বিশেষ কমিটি সংসদ গঠনের প্রথম অধিবেশনের মধ্যে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল দলের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।[৮] কমিটির সদস্যদের এমনভাবে নির্বাচন করা হবে যেন এ কমিটিতে সরকার ও বিরোধী দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, নারী সদস্য ও সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ হলে উভয় কক্ষে একই নিয়মে প্রতিনিধিত্বসহ যৌথ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটির সদস্যপদ শূন্য হওয়া সাপেক্ষে একই শর্তের ভিত্তিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

১২.৪. এ কমিটির সভাপতি হবেন ডেপুটি স্পিকার। কমিটি গঠনের পর সদস্যরা বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করবেন।

১২.৫. গঠন থেকে শুরু করে সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম বলবৎ থাকবে।

১২.৬. স্পিকার "আপিল কর্তৃপক্ষ" হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন, যেখানে কোনো অভিযুক্ত সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত মনঃপূত না হলে আপিলের সুযোগ থাকবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধীদলীয় নেতার সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট খাতের নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

১২.৭. কমিটির একটি স্থায়ী "নৈতিকতা সচিবালয়" (Ethics Secretariat) গঠিত হবে, যেখানে আইন, মানবাধিকার তদন্ত, আর্থিক বিশ্লেষণ ও সম্পদ ঘোষণার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা থাকবে। এই সচিবালয়ের অধীনে সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনসংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন তদন্ত ইউনিট থাকবে।

১২.৮. নৈতিকতা সচিবালয়ের প্রধান হিসেবে একজন স্বাধীন "সংসদীয় নৈতিকতা কমিশনার" (আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বা সমমর্যাদার ব্যক্তি) নিয়োগ দেওয়া হবে, যিনি সংসদ নেতা ও বিরোধীদলীয় নেতার ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্পিকারের সুপারিশে পাঁচ বছরের একক মেয়াদে নিযুক্ত হবেন এবং মেয়াদকালে আপিল বিভাগের বিচারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ ছাড়া অপসারণযোগ্য হবেন না। কমিশনার অভিযোগ গ্রহণ, প্রাথমিক যাচাই ও তদন্ত করবেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন নৈতিকতা কমিটিতে দাখিল করবেন এবং কমিটি প্রতিবেদন বিবেচনা করে শাস্তির সুপারিশ করবেন।

১৩. নৈতিকতা কমিটির ক্ষমতা ও কাজ

১৩.১. কমিটি আচরণবিধি অভিযোগ নিরসনসংক্রান্ত একটি নির্দেশনা (গাইডলাইন) তৈরি করবে, যেখানে অভিযোগ গ্রহণ, অভিযোগ নিরসনপ্রক্রিয়া, কোন অভিযোগের কী শাস্তি ইত্যাদি নির্ধারণ করবে।

১৩.২. কমিটি সময়ে সময়ে আচরণবিধি সংশোধনের সুপারিশ করবে এবং সময়ে সময়ে উদ্ভূত নতুন নৈতিক চ্যালেঞ্জ অন্তর্ভুক্ত করবে।

১৩.৩. কমিটি সংসদ সদস্যদের নৈতিকতা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন দেবে, প্রশিক্ষণ আয়োজন করবে এবং আচরণবিধি সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ ছাড়া, সদস্যদের নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে, সম্ভাব্য স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কে মতামত দেবে এবং আচরণবিধির ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

১৩.৪. কমিটি সদস্যদের সম্পদ, ব্যবসায়িক স্বার্থ, শেয়ার, কোম্পানির মালিকানা, উপহার ও ভ্রমণ সুবিধা, ইত্যাদি স্বার্থসংশ্লিষ্ট তথ্য নিবন্ধন করবে, বার্ষিক সম্পদ ঘোষণার রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে এবং জনগণের জন্য প্রকাশ করবে।

১৩.৫. এই কমিটি আচরণ লঙ্ঘনের অভিযোগ না থাকলেও স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রতি তিনমাসে অন্তত একবার বৈঠকে মিলিত হবে।

১৩.৬. কোনো সদস্যের আচরণ বা কর্মকাণ্ড আচরণ আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে, যে কেউ লিখিতভাবে নৈতিকতা কমিটির কাছে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। এ ছাড়া, যে কোনো সংবাদমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত বা প্রকাশিত উত্থাপিত অভিযোগ নৈতিকতা কমিটি স্বপ্রণোদিতভাবে আমলে নেবে।

১৩.৭. প্রাথমিকভাবে অভিযোগের স্বপক্ষে যদি যথেষ্ট যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণ আছে বলে কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয়, তাহলে কমিটি অভিযোগ প্রাথমিকভাবে যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা করবে। এই কমিটির কোনো ব্যক্তিকে তলব করা, নথি, ব্যাংক রেকর্ড বা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আহ্বান করা, বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করা এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে।

১৩.৮. অভিযোগ প্রাপ্তির সাত (৭) কার্যদিবসের মধ্যে প্রাপ্তিস্বীকার এবং সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে; প্রাথমিক যাচাই ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নব্বই (৯০) দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে। অভিযুক্ত সদস্য অভিযোগ ও প্রমাণ দেখার, লিখিত ও মৌখিক জবাব দেওয়ার এবং প্রতিনিধি রাখার অধিকার পাবেন। সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তদন্তের তথ্য গোপন থাকবে।

১৩.৯. কমিটির সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত থাকলে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিবেচনা থেকে কমিটি থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

---

[৮] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে সংসদে এই আইন গৃহীত হওয়ার পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যেই নৈতিকতা কমিটি গঠিত হবে।

১৩.১০. তদন্তে অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হলে অবিলম্বে এর নিষ্পত্তি করা হবে। তবে তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক সৃষ্ট "কাউন্সিলিং উপ-কমিটি"–এর মাধ্যমে অভিযুক্ত সংসদ সদস্যকে পরামর্শ বা উপদেশমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি ফলপ্রসূ না হলে, পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে নৈতিকতা কমিটি সংসদে সুনির্দিষ্ট শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশসহ প্রতিবেদন আলোচনার জন্য দাখিল করবে।

১৩.১১. তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে, কমিটি যে সব শাস্তির সুপারিশ করতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে– সতর্কীকরণ (warning), ভর্ৎসনা (reprimand), প্রকাশ্য তিরস্কার (censure), ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ, সংসদীয় সুবিধা স্থগিত, স্থায়ী কমিটির সদস্যপদ বাতিল, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংসদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত এবং গুরুতর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের কাছে সদস্যপদ বাতিলের সুপারিশ।

১৩.১২. কমিটির প্রতিবেদনের সাথে একমত না হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য স্পিকারের কাছে আপিল করতে পারবেন।

১৩.১৩. স্পিকার নৈতিকতা কমিটির প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এর বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। দলীয় পরিচয় নির্বিশেষে একই মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হবে। আইনের লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩.১৪. অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত সংসদ সদস্য কমিটির যে কোনো নির্দেশ পালনে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন।

১৩.১৫. কমিটি এর কার্যক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করবে, যার মধ্যে থাকবে অভিযোগ ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা ও জনসমক্ষে প্রকাশ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৩.১৬. আচরণ আইন সংশোধনকল্পে কমিটি যে কোনো সময় সংসদে বা নৈতিকতা কমিটির নিকট সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবে, তবে এরূপ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হবে।

১৪. সংজ্ঞা: আচরণবিধি বা আইনে উল্লিখিত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা আইনের শুরুতে উল্লেখ করতে হবে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

- "জাতীয় সংসদ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জাতীয় সংসদ।
- "সংসদ সদস্য" অর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত এবং সংরক্ষিত আসনের কোনো সদস্য, যাদের মধ্যে (টেকনোক্র্যাট ব্যতীত) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ অন্তর্ভুক্ত।
- "মন্ত্রী" অর্থ মন্ত্রী সভার কোনো সদস্য এবং "মন্ত্রী" বলতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীগণ ও উপমন্ত্রীগণ অন্তর্ভুক্ত।
- "কার্যপ্রণালী বিধি" অর্থ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি।
- "নৈতিকতা" অর্থ হলো নীতি, সততা, ন্যায়পরায়ণতা বা সদাচার। এটি এমন কোনো কাজ, আচরণ বা চিন্তাকে বোঝায় যা ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত এবং সততার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- "স্বার্থের সংঘাত" বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে কোনো সদস্য তার অবস্থান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক বা আর্থিক লাভের বিবেচনায় প্রভাবিত হন।
- "নির্ভরশীল" বলতে বোঝায় ১৮ বছরের কম বয়সী কোনো সন্তান, অথবা ১৮ বছরের বেশি বয়সী এমন কোনো সন্তান যিনি আর্থিকভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যের ওপর নির্ভরশীল।
- "পরিবারের সদস্য" বলতে কোনো সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী, বা তাদের পোষ্যদের (সন্তান, পিতা-মাতা) বোঝায়।
- "আত্মীয়" বলতে পরিবারের সদস্য ছাড়াও সদস্যের বা তাঁর স্বামী/স্ত্রীর পিতা-মাতা, ভাই-বোন, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং তাঁদের স্বামী/স্ত্রীকে বোঝায়।
- "ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সহযোগী" বলতে এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যার সঙ্গে সদস্য বা তাঁর পরিবারের সদস্যের যৌথ ব্যবসা, অংশীদারিত্ব বা উল্লেখযোগ্য আর্থিক লেনদেন রয়েছে।
- "জনস্বার্থ" অর্থ এমন কোনো ফলাফল যা জনগণের কোনো অধিকার, সরকারি অর্থ-সম্পদ, সেবা বা উন্নয়ন ও জনকল্যাণকে প্রভাবিত করে।
- "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম" বলতে এমন কোনো ইন্টারনেট-ভিত্তিক ব্যবস্থা বা অ্যাপ্লিকেশনকে বোঝায়, যা তথ্য, বিজ্ঞাপন, যোগাযোগ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীর তৈরি কোনো তথ্য, অভিমত বা বিষয়বস্তু (user-generated content) সৃষ্টি, আদান-প্রদান, প্রকাশ, প্রচার বা শেয়ার করার কাজে ব্যবহৃত হয়।